নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিমিরতীর্থ' : এক স্বদেশি সৈনিকের পালা

মৃণালচন্দ্র হালদার

পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম বাসুদেবপুর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ তখন যেমন অসহযোগ পর্যন্ত পৌঁছেছে তেমনি ভিতরের সশস্ত্র বিপ্লবের অভিমুখও দুই বঙ্গের কোণায় কোণায় ঝাপটা দিচ্ছে ভালোরকমভাবে। দুঃখের বিষয় এই বাসুদেবপুর গ্রামে তখনও পর্যন্ত কোনো স্বদেশি অন্দোলনের বীজ উঁকি দেয়নি। এই গণ্ডপল্লীতে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বপন করতে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত নামে এক ছদ্মবেশী বিপ্লবী শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত হলেন।

আড়িয়াল খাঁ নদীর ভরা যৌবন সবেমাত্র একটু ঢলে পড়েছে। আশ্বিন মাস। যৌবন-গগনে ঢল নামারই কথা। সেদিন মিহিকুয়াশায় ভোরাই আড়িয়াল খাঁর বুক চিরে পারঘাটের স্টীমার পৌঁছাল সাহেবপুর ঘাটে। এখানে নেমে গ্রামবাসীরা যে যার পায়ে হেঁটে পরিবার মুখো হয়। বিচিত্র যাত্রীদের সঙ্গে সাদামাটা একটি মাত্র তোরঙ্গ হাতে নিয়ে পাড়ে নামলেন প্রফুল্ল। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসছেন প্রফুল্ল। ফলে একটা সম্মান ও সুনাম তাঁর গায়ে জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক। তাঁকে বরণ করতে এসেছেন গাঁয়ের মুকুল ও রবি। স্কুলের সম্পাদক রামমোহন সেনের নির্দেশ মতই রবি ও মুকুল এ কাজে ব্রতী হয়েছিলো।

যাইহোক, রাসু সেনের বাড়িতেই আশ্রয় পায় প্রফুল্ল। এ নিয়ম প্রথম থেকেই বলবৎ রয়েছে এ গাঁয়ে। বিদেশি শিক্ষক সেক্রেটারির বাড়িতেই বরাবর আশ্রয় পেয়ে থাকেন। প্রফুল্ল সেনগুপ্তের আশ্রয় তাই বরাবরের প্রথা মেনে হল বলা যায়।

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত: চক্রবাক, অরণ্য ও তিমিরতীর্থ। আর কোনো অধ্যায় বিভাজন নেই সেই অর্থে। তিন পর্বের নামের মধ্যে রয়েছে উপন্যাসের মূল কাহিনীর - সূচনা-বিস্তার ও সমাপ্তি।

চক্রবাক

এই পর্বে উপন্যাসের সূচনা। শুরুতেই আড়িয়াল খাঁ'র স্টীমার ঘাট। যা সাহেবপুর ঘাট নামে পরিচিত। আশ্বিনের ভোরবেলায় যে প্রথম স্টীমার তাতে

চেপে আসার কথা প্রফুল্লের। আড়িয়াল খাঁর জল-ভোরবেলার ক্ষয়িষ্ণু অন্ধকার আর মিহিকুয়াশায় সমস্ত নদী ঘটিটাই যেন কোন রহস্যময়তায় একাকার। মুকুল আর রবি - প্রফুল্লবাবুকে পথ চিনিয়ে গ্রামে আনার জন্য রাসু সেনের নির্দেশেই সেখানে আগেভাগেই উপস্থিত। রাসু সেন বর্তমান সম্পাদক বলে প্রধান শিক্ষকের লালন পালনের ভারও তাঁর উপর।

দুই মূর্তিমানের সঙ্গ নিয়ে প্রফুল্ল আকণ্ঠ গ্রামটাকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু মন দিয়ে মাপতে থাকে। গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষগুলোর একটা প্রাথমিক গন্ধ সে পেয়ে যায় এই নির্মল সকালে। ব্রাহ্মণ প্রধান বাসুদেবপুর একটা সময় ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগের পরম্পরার ধারাপাত বজায় থাকলেও বর্তমান সময়ে তার বেশ খানিকটা পটপরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করে থাকি এ উপন্যাসে। এক্ষণে স্কুলের পরিচালন সমিতির কর্ণধার রাসু সেন ঠিকই, আবার নরেশ কর কিংবা রমেশ চৌধুরীর মত অব্রাহ্মণ মানুষের উত্থান সে কথা স্পষ্ট করে দেয়। এ প্রসঙ্গে মূল উপন্যাস অনুসরণ করা যেতে পারে:

'বল কি হে। রমেশ চৌধুরী হবে এবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।' ... তুমি বেঁচে থাকতে গাঁয়ের মধ্যে এতবড় অঘটনটা ঘটবে?'

ব্রজবিহারীর মুখ সাদা হয়ে যায় একথা শুনে। কিন্তু ব্রজবিহারী মুখুজ্জের মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য সাদা হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে : "শুদ্দুরের টাকার জোর হয়েছে? ও অহংকারের পয়সা ক'দিন থাকবে?"

তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি ব্রাহ্মণতন্ত্রের এতদিনের শাসনদণ্ড খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এ সত্য বুঝতে দেরি হয়না স্বদেশি সৈনিক প্রফুল্লের। আর এর মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার স্বপ্ন বোনার ক্ষেত বা জমিটাকে।

অরণ্য

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব হল 'অরণ্য'। পার্বিক নামের মধ্যেই এ পর্বের মূল সুর খানিকটা পাঠকের কানে ধ্বনিত হয় সন্দেহ নেই। এ পর্বে চারটি চরিত্রের উপস্থিতি এই গর্ভাঙ্ককে ঘনীভূত করে তোলে; সেই সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির গতিপথকে সরলরেখা থেকে খানিকটা বক্রপথে চালিত করে বলা যেতে পারে। এই চারটি চরিত্র হল : প্রফুল্ল, নীলিমা, শুক্লা ও তপন। প্রফুল্লের পরিচয় আমাদের জানা। অপর দুই নারী ও এক পুরুষ চরিত্রের কথায় আসা যাক। নীলিমা বা

নীলু রাসু বাবুর কন্যা। সম্পাদক রাসু সেন। এঁরই ভাইঝি হল পিতৃহারা শুক্লা। আর তপন হল পল্লীর শিক্ষিত যুবক-স্বভাব কবি। সে তপন কবি হিসাবে গ্রামে পরিচিতও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শুক্লা, বাবা মারা যাওয়ার পরে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে কাকার বাড়িতে আশ্রয় পায়। যদিও পিতার রেখে যাওয়া মোটা টাকার উত্তরাধিকারিণী সে।

পল্লির পথে পথ চলতে চলতেই একদিন তপন কবির সঙ্গে আলাপ হয় শুক্লার। আলাপ থেকে প্রেম। তারপর সেই প্রেমাঙ্কুরের ধীরে ধীরে বৃদ্ধি। নীলুর ভালোবাসার পাত্র আর কেউ নয় - স্বয়ং প্রফুল্ল। প্রফুল্ল মাস্টার। ছদ্মবেশী স্বদেশি সৈনিক। তার পিতার গৃহেই সে আশ্রিত। তাই নীলুর পথ চলতে হয় না অভিসারির মত, কারণ তার প্রিয়তম তার গৃহে এক প্রকার বন্দী বলা যায়।

কিন্তু তপন-শুক্লার আকর্ষণ যেমন উভয়ের আন্তরিক টানের মধ্যে আবর্তিত, তেমনটা কিন্তু নীলুর ক্ষেত্রে নয়। কারণ স্পষ্ট। প্রফুল্ল নামক পুরুষ মানুষটি তো আর আটপৌরে মানুষের মত নয়। সে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য উৎসর্গিত। তার দেহ-মন বিসর্জিত দেশের জন্য। ফলে নীলিমার ডাকে সাড়া দিতে পারে না। পারার কথাও নয়। তাই নীলুর ভালোবাসা কেমন যেন এক তরফা হয়ে যায়। প্রফুল্ল'র দিক থেকে কোনো তাগিদ না দেখতে পেয়ে নীলু তাই হতাশ-হাঁফিয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে প্রফুল্ল তার আসল কর্মটি গোপনে গোপনে চালিয়ে যেতে থাকে। তবে স্বদেশি গান-স্বদেশি কাজকর্ম প্রথম প্রথম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমল না দিলেও, পরে পরে প্রফুল্ল ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। তার এই কাজ-কর্ম পরাধীন ভারতে বড় বিপদজনক-তা বুঝতে পারেন তাঁরা। এমনটি চলতে থাকলে বৃটিশ সরকার অনুদান বন্ধ করে দেবে। বিদ্যালয়-এর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। সেজন্য তাঁরা প্রফুল্ল'র এই কাজ-কর্ম বন্ধ করতে বলে। ইংরেজ ভজনা ছেড়ে-ইংরেজ তাড়ানোর কাজ কোনোভাবে বরদাস্ত করা যাবে না। তাতে ভয়ানক ক্ষতি গ্রামের। গ্রামের মানুষেরা আর সেই সঙ্গে স্কুলের হাল তো বেহাল হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ততক্ষণে প্রফুল্লর স্বদেশি মন্ত্র বাতাসে মিশে গেছে। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে। মুকুল, নন্তু, নরেশ এমন কী স্বয়ং রাসু সেনও ভিতরে ভিতরে বুঝেছিলো প্রফুল্ল সাধারণ মানুষ নয়। এর মধ্যে খাঁটি বস্তু আছে। অন্ধ-বধির মানুষকে এ আলো দিতে পারে, ভাষা দিতে পারে।

'তিমির তীর্থ'

উপন্যাসের শেষ পর্বটি হল 'তিমির তীর্থ'। এই পর্বের নামেই উপন্যাসের নামকরণ। সে দিক থেকে শেষ অধ্যায়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হবে বলে ধরা যেতে পারে।

বাসুদেবপুর গ্রাম প্রফুল্লের ক্ষেত্রভূমি। এ গ্রাম তার কাছে তীর্থভূমি। তবু সে তীর্থ-তিমির তীর্থ। আঁধারে নিমজ্জিত তীর্থ। এই অন্ধকারময় তীর্থে প্রদীপ জ্বালাতে এসেছে প্রফুল্ল। সে এক প্রকার বাতিওয়ালা। স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিক প্রফুল্ল আজ বাসুদেবপুরের মত গণ্ড গাঁয়ে এসেছে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু গ্রাম অন্ধকারে ঢাকা। পথ অন্ধকারে ঢাকা, গ্রামবাসী কেমন করে খুঁজে পাবে এই বীজ মন্ত্র। তাই অন্ধ গ্রামবাসীর দুই চোখে আলো জ্বালতে হবে। তারপর স্বদেশ-স্বজাতি ইত্যাদি।

ছোট্ট বিদ্যালয়টি প্রফুল্লর উপলক্ষ মাত্র। তবে এই আলয় থেকেই বের হবে ছোটো ছোটো জ্বলন্ত সূর্য। সে কথা জানে সে। আর আকণ্ঠ জানে বোকে বোলেই বিদ্যালয়টি তার কাছে খেত। চাষের জমি। তবে এ জমিতে ফসল নয় - মানুষ গড়া হয়। মানুষ গড়ার কারিগর সে। তাই আজ দক্ষ কারিগরের মত তার কর্মপরিধি বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। কায়েমি ঘুঘুর দল প্রমাদ গোণে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

এদিকে রাসু সেনের কন্যা নীলিমা তার ভালোবাসার পাত্রকে ঘরের মধ্যে, চৌহদ্দির মধ্যে পেয়েও ধরতে পারে না। প্রফুল্ল তার নিবেদিত-সমর্পিত প্রাণকে স্পষ্ট করে বলেও দেয় - সে সংসারের জন্য নয়। সে ব্যক্তির জন্য নয়, সে সমষ্টির জন্য। দেশের জন্য-স্বজাতির জন্য। তাই তার জন্য সুখশয্যা নয়। তার পথ কণ্টকময়। কর্দমময়। এই দেশ-এই পৃথিবী তার সংসার। এর শৃঙ্খল মোচনের জন্য সে পথে বেরিয়েছে। তাই এ জ্বলন্ত পিণ্ড থেকে সে যেন দূরে থাকে। সরে থাকে।

গ্রামের মোড়ল-মাতব্বর সব দল বেঁধে নেমে পড়ে প্রফুল্ল মাস্টারকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর জন্য। এদিকে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত আরো জোর কদমে তার সভা-সমিতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এখন সে আর একা নয়। মুকুল, বিধু, নরেশ কর আরো অনেকে। গ্রামের তরুণ সমাজ বলতে গেলে এখন প্রফুল্ল মাস্টারের সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

প্রবীণ-আধমরার দল আর যে যার ঘরে বসে থাকতে পারলো না। রাসু সেনের বাড়িতে জড়ো হয়। সেন মশায় অনেক আগে থেকে বিষয়টা ধরতে

পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তো মনে মনে পূর্ণ সমর্থন করে বসেছিলেন প্রফুল্লর কাজ-কর্মকে। এই অল্প দিনের মধ্যে সে যে ভাবে বিদ্যালয়কে একটা উন্নত মানানসই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে; এরপর আর কিছু বলার নেই। তবু তাকে বলতে হবে এখান থেকে, এ গাঁ ছেড়ে চলে যেতে।

বৃটিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন দপ্তরে এ সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার লোকের অভাব নেই। এমন বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ সব গাঁয়ে আছে, এখানেও তার অভাব নেই। দেশীয় পুলিশ অফিসার এর নেতৃত্বে একটা বড় পুলিশ বাহিনী দিনের শেষে প্রফুল্লসহ আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেন। সন্ধ্যা সবে উঁকি দিয়েছে প্রতিদিনের মত এই গ্রামে - এই বাসুদেবপুরে। দু'খানি বড় বড় স্টীমার সদৃশ নৌকায় তোলা হল বন্দীদের। প্রধান বন্দী প্রফুল্ল সেনগুপ্ত।

একদিন কুয়াশামাখা প্রভাতে এই সাহেবপুর ঘাটে পৌঁছেছিলো প্রফুল্ল, আজ সে ঘাট থেকেই ফিরতে হচ্ছে - তবে সময়টা সন্ধ্যা বেলা, তবে কী 'তিমিরতীর্থ' একেবারে তিমিরেই রয়ে গেল? বোধহয় না। এই ঘন আধার ঘেরা তীর্থে যে আলোর শিখা তিনি জ্বালিয়ে গেলেন তা কখনই নিভে যাবে না। কাল থেকে কালান্তরে এই 'তিমির তীর্থ' আলোর তীর্থে পরিণত হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (মিত্র ও ঘোষ)
২। কালের প্রতিজ্ঞা—মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার।
৩। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ।
৪। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার।
৫। বাংলা কথাসাহিত্যে জিজ্ঞাসা—মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার।
৬। বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল—মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার।